Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.60-70
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বৈশেষিক ও আয়ুর্বেদশাস্ত্র সম্মত পদার্থতত্ত্ব: একটি সমীক্ষা

তিথি নস্কর

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, গৌর মোহন শচীন মণ্ডল মহাবিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract:

The world where living and non-living beings exist are full of innumberable objects (Padārthas). So we are habituated to see this world in the context of Padārthas. 'Padārtha' literally means the objects denoted by a word. According to the Vaiśeṣikas all objects are broadly divided into two classes i.e. being (Bhāva) and non-being (Abhāva). There are six kinds of Bhāva Padārthas namely substance (Dravya), quality (Guṇa), action (Karma), generality (Sāmānya), particularity (Viśeṣa) and inherence (Samavāya). Āyurveda system also acceptes six types of Bhāva Padārthas i.e. generality(Sāmānya), particularity(Viśeṣa), Substance(Dravya), quality(Guṇa), action(Karma) and inherence(Samavāya). A lot of similarities are shown in the theory of Padārthas of Āyurveda and Vaiśeṣika system. But the main goal of the two systems are not same. The main goal of Vaiśeṣika Śhastra is to attain liberation or Mokṣha. According to Vaiśeṣikas Mokṣha means 'permanently free from all kinds of pain and sufferings'. On the other hand, the main goal of Āyurveda Śhastra is to maintain the good health through curing the diseses and achive long life. Although both systems admit that ignorance about six Padārthas is the root cause of all pain and sufferings. Through this research paper I want to delve a comparative and comprehensive study of the theory of Padārthas between Āyurveda and Vaiśeṣika system.

Key words: Padārtha, Mokṣha, Dravya, Guṇa, Vaiśeṣika, Āyurveda

জীব ও জড় – এই উভয় যে জগতে অবস্থান করে, সেই জগৎ পদার্থময়। তাই জাগতিক পদার্থসমূহের দ্বারা ঋদ্ধ এই বিশ্বজগৎকে পদার্থের দৃষ্টিতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অসংখ্য পদার্থ নিয়ে গঠিত আমাদের চিরপরিচিত জগতেই জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনে আমরা কেবল আবর্তিত হয়েই চলেছি। যা শঙ্করাচার্যের কথায় – "পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্"। এই আসা যাওয়া পথের মাঝে আমরা জাগতিক পদার্থ সমূহকে এক ঝলক দেখে নেব দর্শনের আলোকে। "পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ" অর্থাৎ পদের অর্থ হল পদার্থ। একটি পদ তার স্বনিষ্ঠ বৃত্তির দ্বারা যে অর্থকে উপস্থাপিত করে তা হল পদার্থ। ভারতীয় শাস্ত্রে 'পদার্থ' শব্দটির অন্তর্গত 'অর্থ' পদটির দ্বারাই পদার্থের লক্ষণ বলা হয়েছে। অমরকোশে বলা হয়েছে, "অর্থহভিধেয়োরৈবস্তুপ্রয়োজননিবৃত্তেষু"[1] অর্থাৎ অর্থ শব্দ অভিধেয়, ধন, বস্তু,

[1] Sastri, Pt. Hargovinda, Amarkosa, Varanasi, Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1998, page- 453.

প্রয়োজন ও নিবৃত্তির বাচক। সুতরাং 'অর্থ' পদের দ্বারাই পদার্থের সামান্যলক্ষণ সূচিত হয়েছে 'অভিধেয়ত্ব'। 'অভিধেয়ত্ব' মানে অভিধাশক্তিবিষয়ত্ব। এখন অনেকে অর্থ পদের বুৎপত্তির দ্বারা পদার্থের আরও একটি লক্ষণ সূচিত করেন। তাঁদের অভিমত হল, ঋগতৌ 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'থ' (ঔণাদি থ) প্রত্যয় যোগে 'অর্থ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। 'ঋ' ধাতুর অর্থ গতি। এখন নিয়ম আছে গত্যর্থক ধাতু জ্ঞানার্থকও হয়। কাজেই 'ঋ' ধাতুর অর্থ হয় জ্ঞান। আর 'থ' প্রত্যয়ের অর্থ হয় বিষয়তা। সুতরাং 'অর্থ' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল জ্ঞানবিষয়ত্ব। অভিপ্রায় হল, যা জ্ঞানের বিষয় হয় অর্থাৎ যা জ্ঞেয় তাই পদার্থ। এমতাবস্থায় আপত্তি ওঠা অসঙ্গত নয় যে, এমন অনেক বস্তু থাকতে পারে যা আমাদের জ্ঞানের বিষয় নয়; যা জ্ঞেয় নয়, সেক্ষেত্রে উক্তরূপ অজ্ঞাত বস্তুমাত্রকে পদার্থ বলা কি সঙ্গত হবে? এর উত্তরে আচার্য্যগণ বলেন, সব বস্তু জ্ঞেয় না হলেও, অন্তঃত জ্ঞাত হওয়ার যোগ্যতা আছে। তাছাড়া ঈশ্বর হলেন সর্বজ্ঞ, এ জগতের এমন কোন কিছুই নেই যা তাঁর জ্ঞানের বিষয় নয়। সব বস্তুই ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় হয়েই অবস্থান করে। তাই জ্ঞানবিষয়ত্বই হল পদার্থের লক্ষণ। তদনুরূপ প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্বও পদার্থের লক্ষণ হতে পারে। শিবাদিত্য তাঁর 'সপ্তপদার্থী' গ্রন্থে বলেছেন, ''প্রমিতিবিষয়াঃ পদার্থাঃ''[2]। অর্থাৎ প্রমিতির যা বিষয় হয়, সেটি হল পদার্থ। 'প্র' পূর্বক 'মা' ধাতুর সঙ্গে 'ক্তিন' প্রত্যয়যোগে 'প্রমিতি' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। যার অর্থ হল প্রকৃষ্ট বা যথার্থ জ্ঞান (অনুভব)। আর সেই যথার্থ জ্ঞানের (অনুভবের) যা বিষয় তা হল পদার্থ।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা বৈশেষিক দর্শন স্বীকৃত পদার্থতত্ত্ব এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্রে স্বীকৃত পদার্থতত্ত্ব বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা করব। এখন প্রশ্ন হতেই পারে পদার্থ বিষয়ে প্রায় সব ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় স্বল্প-বিস্তর আলোচনা করেছেন, তাহলে কেন সেগুলির মধ্যে বৈশেষিক ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের পদার্থতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনায় আগ্রহী হয়েছি? এর উত্তরে বলা যায় ভারতীয় শাস্ত্রসমূহের মধ্যে বৈশেষিক শাস্ত্রই প্রমেয় শাস্ত্র হিসাবে পরিগণিত। অভিপ্রায় এই যে, প্রায় সব শাস্ত্রই তাঁদের মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পদার্থ বিষয়ক আলোচনায় ব্রতী হলেও, পদার্থ বিষয়ক আলোচনাই বৈশেষিক দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য। অপরদিকে প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম হল আয়ুর্বেদ শাস্ত্র। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মূল গ্রন্থ হিসাবে আমরা চরকসংহিতাকে পাই, যার প্রাচীনত্ব বিষয়ে সবাই সহমত পোষণ করে থাকেন। সেই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উল্লিখিত পদার্থতত্ত্ব ও বৈশেষিক পদার্থতত্ত্বের বহুলাংশে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তাই আমার এই প্রবন্ধে বৈশেষিক শাস্ত্র ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের পদার্থতত্ত্বের ওপর আলোকপাত করার কথা ভেবেছি। যদিও বৈশেষিক দর্শনের পরম লক্ষ্য হল মোক্ষপ্রাপ্তি। তাই বৈশেষিক দর্শনে মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ক রূপে পদার্থতত্ত্বের আলোচনা হয়েছে। অপরদিকে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় হল জীবের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং রোগ নিরাময় করার জন্য যাবতীয় বিধিসকল বর্ণনা করা। কাজেই চিকিৎসার ক্ষেত্রে সহায়ক পদার্থসমূহই আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। উভয়শাস্ত্রের বিষয়বস্তু, মুখ্য উদ্দেশ্য, আলোচনা পদ্ধতি পৃথক হলেও উভয়শাস্ত্র স্বীকৃত পদার্থসমূহের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত। উভয় শাস্ত্রেই দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় – এই ষড়্ ভাবপদার্থ স্বীকৃত হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে আলোচ্য বিষয়বস্তুটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছি। প্রথমভাগে বৈশেষিক দর্শন স্বীকৃত পদার্থসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করেছি।

---

[২] ভট্টাচার্য, জয়(সম্পাদিত), শিবাদিত্য বিরচিত সপ্তপদার্থী, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃষ্ঠা – ৫।

দ্বিতীয়ভাগে আয়ুর্বেদশাস্ত্র স্বীকৃত পদার্থসমূহ আলোচনা করেছি এবং সর্বশেষ ভাগে উভয়শাস্ত্রের পদার্থতত্ত্বের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য উপস্থাপন পূর্বক বৈশেষিক দর্শনের ন্যায় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের পদার্থসমূহের মোক্ষোপযোগীত্ব স্বীকৃত কিনা তা অনুধাবন করা হয়েছে।

(১)

মহর্ষি কণাদ বর্ণিত বৈশেষিক দর্শন প্রমেয়শাস্ত্র রূপে পরিগণিত। যেহেতু প্রমেয় সমূহই এই শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য। 'প্রমেয়' মানে যা প্রমা জ্ঞানের বিষয়। প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের(অনুভবের) বিষয় রূপে পরিদৃশ্যমান জগতের বহু বস্তুই প্রতীত হয়, যেগুলিকে বৈশেষিকাচার্য্যগণ পদার্থ নামে অভিহিত করেছেন। জ্ঞানের বিষয় হিসাবে যে সব বস্তু প্রতীত হয় সেগুলিকে বৈশেষিকাচার্য্যগণ কয়েকটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদ বলেছেন, "ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্"[3]। অভিপ্রায় এই যে, জাগতিক জ্ঞেয় বস্তু অনন্ত সংখ্যক হলেও সেগুলিকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। এই ষড়্‌বিধ পদার্থের সম্যগ্ তত্ত্বজ্ঞান তথা পরস্পরের সাধর্ম্য বৈধর্ম্য ও স্বরূপ বিষয়ে সম্যগ্ জ্ঞান হতে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, জীব মাত্রেরই পরম কাঙ্খিত নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির সহায়ক রূপে মহর্ষি কণাদ দ্রব্যাদি ষড়্ পদার্থের উল্লেখ করেছেন, অভাব পদার্থের উল্লেখ করেননি, তাহলে 'অভাব' নামক পদার্থ কি মহর্ষি সম্মত নয়? এর উত্তরে বলা যায়, অভাবের নিরূপণ প্রতিযোগীর নিরূপণের অধীন হওয়ায় তার পৃথকভাবে উদ্দেশ মহর্ষি করেননি। তথাপি পরবর্তীকালে ভাষ্যকারগণ মহর্ষি প্রদত্ত অনেক সূত্র হতে অভাব নামক পদার্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলে মনে করেছেন। যেমন, 'বৈশেষিকসূত্র'এর সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের একাদশ সূত্রে তিনি বলেছেন, "অণুমহদিতি তস্মিন্ বিশেষভাবাৎ বিশেষাভাবাচ্চ"[4]। তাই অনেক আচার্য মনে করেন অভাব নামক পদার্থটিও কণাদ সম্মত। তাছাড়া মহর্ষি কণাদ মূল সূত্রের 'সৃষ্টি-সংহার প্রকরণ'এ উৎপত্তি ও বিনাশের ব্যাখ্যাতে প্রাগভাব ও ধবংসাভাবের আলোচনা করেছেন। আবার বৈধর্ম্যের ব্যাখ্যাতেও অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাব আলোচিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় অভাব নামক পদার্থটিও মহর্ষি কণাদ সম্মত। সুতরাং বৈশেষিক মতে পদার্থ সাত প্রকার, যথা, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব।এখন বৈশেষিক দর্শন স্বীকৃত পদার্থসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল –

দ্রব্য: বৈশেষিক সম্মত পদার্থসমূহের মধ্যে প্রথম পদার্থ হল দ্রব্য। দ্রব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি কণাদ বলেছেন, "ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষ্যণম্"[5]। প্রদত্ত স্থলে দ্রব্যের তিনটি লক্ষণ বলা হয়েছে। যা ক্রিয়ার আশ্রয় হয় তা হল দ্রব্য। কিন্তু কেবল ক্রিয়ার আশ্রয়কে দ্রব্য বললে আকাশ, কাল, দিক ও আত্মা প্রভৃতি দ্রব্যে অতিব্যাপ্তি হবে। কারণ আকাশাদি বিভু দ্রব্য হওয়ায় তারা নিষ্ক্রিয় হয়। তাই গুণবত্ত্বকে দ্রব্যের লক্ষণ বলা হয়েছে। কিন্তু উৎপত্তিকালীন দ্রব্য গুণহীন হওয়ায় উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি

---

[৩] ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন(অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ বৈশেষিক-দর্শনম্, কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা-১৬।

[৪] ব্রজবিদেহী, মহন্ত শ্রী স্বামী সন্তদাসজী, ওঁ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, শ্রী অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৯২, পৃষ্ঠা-১৫।

[৫] ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন(অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ বৈশেষিক-দর্শনম্ (বৈশেষিক সূত্র সহিতম্), কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা-৪৬।

হয়। এই অব্যাপ্তি পরিহারের নিমিত্ত আচার্যগণ বলেন এস্থলে গুণবত্ত্ব এর অর্থ করতে হবে 'প্রতিযোগীব্যাধিকরণগুণাভাবশূন্যত্ব'। উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে যে গুণাভাব ও তার প্রতিযোগী গুণ, তা সমানাধিকরণ হয়, প্রতিযোগীব্যধিকরণ হয় না। তাই অব্যাপ্তির আশঙ্কা অমূলক। এতদ্ সত্ত্বেও উৎপত্তি বিনষ্ট দ্রব্যে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি থেকেই যায়। এইজন্য দ্রব্যের তৃতীয় লক্ষণ করা হয়েছে – 'সমবায়িকারণং দ্রব্যম্'। দ্রব্য যেহেতু সমবায়ি কারণ হয় সেহেতু সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম হবে দ্রব্যত্ব। কাজেই দ্রব্যত্ব জাতির আশ্রয় হল দ্রব্য। আকাশাদিতে দ্রব্যত্ব জাতি বিদ্যমান থাকে আবার উৎপত্তিকালীন দ্রব্যেও দ্রব্যত্ব জাতি বিদ্যমান থাকে। কাজেই অব্যাপ্তির আশঙ্কা নেই। ফলত 'দ্রব্যত্ববত্ত্বং দ্রব্যং' এটি হল দ্রব্যের লক্ষণ। অর্থাৎ যা ক্রিয়ার আশ্রয় হয়, যা গুণের আশ্রয় হয় এবং যা সমবায়িকারণ তাই দ্রব্য। বৈশেষিকমতে দ্রব্য নয় প্রকার, যথা- পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন। এই নয়প্রকার দ্রব্যের মধ্যে আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন হল নিত্য দ্রব্য; কারণ এদের উৎপত্তি নেই, বিনাশও নেই। কিন্তু পৃথিবী, অপ্, তেজ ও বায়ু পরমাণুরূপে নিত্য, যদিও দ্ব্যণুকাদি হতে স্থূল পৃথিবী, স্থূল অপ্, স্থূল তেজ, স্থূল বায়ু রূপে এগুলো অনিত্য। বৈশেষিক দর্শনে পৃথিবী, অপ্, তেজ বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি দ্রব্যকে ভূতদ্রব্য বলা হয়। এই পাঁচটি ভূতদ্রব্যের সমবায়ে জাগতিক বস্তুসমূহের সৃষ্টি হয়েছে। তাই জাগতিক বস্তু মাত্রই পাঞ্চভৌতিক।

গুণ: বৈশেষিক সম্মত দ্বিতীয় পদার্থ হল গুণ। মহর্ষি কণাদ গুণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – "দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্"[6] অর্থাৎ যা দ্রব্যাশ্রিত, অগুণবান্ এবং সংযোগ বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ নয়, তাকে গুণ বলে। অভিপ্রায় এই যে, গুণ মাত্রই দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। তাই দ্রব্য হল আশ্রয় আর গুণ হল আশ্রিত। গুণ স্বরূপত গুণহীন কারণ গুণে গুণ থাকতে পারে না, সেক্ষেত্রে অনবস্থা দোষ হয়। কর্ম সংযোগ বিভাগের অনপেক্ষ কারণ হয় অর্থাৎ কর্ম অন্য কোন ভাব পদার্থকে অপেক্ষা না করেই সংযোগ বিভাগের কারণ হতে পারে। কিন্তু গুণ কখনও সংযোগ বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ হয় না। তাই দ্রব্যাশ্রিত, গুণহীন এবং সংযোগ বিভাগের যা অনপেক্ষ কারণ নয়, তাকে গুণ বলা হয়েছে। বৈশেষিক দর্শনে চব্বিশ প্রকার গুণ স্বীকৃত হয়েছে। যদিও মহর্ষি কণাদ বৈশেষিকসূত্রে সতের প্রকার গুণেরই উদ্দেশ করেছেন। তিনি বৈশেষিকসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ষষ্ঠসূত্রে বলেন, "রূপরসগন্ধস্পর্শঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথকত্বং সংযোগ-বিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ"[7]। যদিও প্রশস্তপাদাচার্য মহর্ষি স্বীকৃত সতেরটি গুণ অতিরিক্ত গুরুত্ব, দ্রব্যত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট(ধর্ম ও অধর্ম) ও শব্দ - এই সাতটি গুণ মহর্ষি সম্মত বলে স্বীকার করেন। সুতরাং বৈশেষিকমতে গুণ হল চব্বিশ প্রকার।

কর্ম: বৈশেষিক সম্মত সপ্ত পদার্থের মধ্যে তৃতীয় পদার্থ হল কর্ম। কর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – "একদ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষং কারণমিতি কর্মলক্ষণম্"[8] অর্থাৎ যা একৈক তথা যা এককালে একাধিক দ্রব্যে থাকে না, নির্গুণ এবং সংযোগ-বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ হয় তা হল কর্ম। বৈশেষিক দর্শনে

---

[৬] ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৮।

[৭] ঐ, পৃষ্ঠা- ৩০।

[৮] ঐ, পৃষ্ঠা- ৫২।

পাঁচপ্রকার কর্ম স্বীকৃত হয়েছে। যথা- উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন[9]। যে ক্রিয়ার দ্বারা ঐ ক্রিয়ার আশ্রয় দ্রব্যের সাথে ঊর্ধ্বদেশের সংযোগ হয় তাকে উৎক্ষেপণ বলে। যেমন একটা বলকে যখন উপরের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, তখন বলটির সাথে ঊর্ধ্বদেশের সংযোগ স্থাপিত হয়, যে ক্রিয়ার দ্বারা বলটির ঊর্ধ্বদেশের সাথে সংযোগ হয়, তাকে উৎক্ষেপণ বলে। অবক্ষেপণ হল সেই ক্রিয়া যার দ্বারা ঐ ক্রিয়ার আশ্রয় দ্রব্যের অধোদেশের সঙ্গে সংযোগ হয়। আকুঞ্চন হল সেই ক্রিয়া যার দ্বারা ঐ ক্রিয়ার আশ্রয় দ্রব্যের শরীরের সন্নিকৃষ্ট দেশের সঙ্গে সংযোগ হয়। আকুঞ্চনের ঠিক বিপরীত ক্রিয়া হল প্রসারণ। যার দ্বারা শরীরের দূরবর্তী দেশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ হয়। আর উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন ও প্রসারণ এই চারটি ক্রিয়া ব্যতীত সমস্ত গতি বিশেষ কর্মই গমনের অন্তর্ভুক্ত।

সামান্য: বৈশেষিক দর্শনে যে সপ্তবিধ পদার্থ স্বীকৃত তন্মধ্যে চতুর্থ পদার্থ হল সামান্য। 'সমানানাং ভাবঃ' এরূপ অর্থে সমান শব্দের উত্তর 'য্যঞ্' প্রত্যয় যোগে সামান্য শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ হল সাধারণ ধর্ম। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে সামান্য শব্দটি সাধারণ ধর্ম অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। সামান্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- "নিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্বম"[10] অর্থাৎ যা নিত্য তথা উৎপত্তি বিনাশ রহিত এবং অনেক অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি হয় তাকে সামান্য বলা হয়। বৈশেষিকমতে সামান্য দুইপ্রকার, যথা- পরসামান্য এবং অপরসামান্য। যে সামান্য সমস্ত জাতির ব্যাপক, যে জাতিকে অন্য কোনও জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, তাকে পর সামান্য বলে। যেমন, সত্তা। অপরদিকে যে জাতি সর্বাপেক্ষা কম ব্যাপক তাকে অপর সামান্য বলে। যেমন- ঘটত্ব। ঘটত্ব কেবলমাত্র ঘটেই থাকে। অনেকে পর ও অপর এর মধ্যবর্তী পরাপর নামক একটি সামান্য স্বীকার করেন। যে সামান্য কোন এক সামান্যের তুলনায় ব্যাপ্য আবার কোন এক সামান্যের তুলনায় ব্যাপক তাকে পরাপর সামান্য বলে। যেমন- দ্রব্যত্ব, দ্রব্যত্ব সামান্য ঘটত্বের তুলনায় ব্যাপক আবার সত্তা জাতির তুলনায় ব্যাপ্য।

বিশেষ: বৈশেষিক সম্মত পঞ্চম পদার্থ হল বিশেষ। বৈশেষিক দর্শনে 'বিশেষ' নামক পদার্থটি একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে রয়েছে। অনেক আচার্য মনে করেন বিশেষ নামক পদার্থটিকে স্বীকার করার জন্যই এই সম্প্রদায়ের নাম বৈশেষিক হয়েছে। বিশেষের লক্ষণ প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদাচার্য বলেন "নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ঃ অন্ত্যাঃ বিশেষাঃ"[11]। অভিপ্রায় এই যে বৈশেষিক মতে অনিত্য দ্রব্য সমূহের ভেদ তাদের নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতির মাধ্যমে সাধিত হলেও দুটি নিত্য দ্রব্যের ভেদ; যেমন দুটি সজাতীয় পরমাণুর মধ্যে ভেদ সাধন তাদের নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়াদির মাধ্যমে সম্ভব হয় না। তাই বৈশেষিক দর্শনে পঞ্চম একটি পদার্থ স্বীকৃত হয়েছে, তা হল বিশেষ। এই বিশেষ পদার্থটি নিত্য দ্রব্যে বৃত্তি হওয়ায় তা নিত্য; আর প্রতিটি নিত্য দ্রব্যে পৃথক পৃথক বিশেষ স্বীকৃত হওয়ায় বৈশেষিক মতে বিশেষ অসংখ্য। এখানে উল্লেখ্য যে গোত্ব প্রভৃতি সামান্য যেমন সমস্ত গোরুতে বিদ্যমান থেকে 'এটি গোরু' এরূপ অনুগতাকার জ্ঞানের জনক হয়; তদনুরূপ গোত্ব সামান্যটি তার আশ্রয় সমস্ত গোরুকে অশ্বাদি প্রাণী হতে ব্যাবৃত্ত করে। অর্থাৎ তা ব্যাবর্তকও হয়ে থাকে। কিন্তু

---

[৯]" উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি কর্ম্মাণি"(বৈশেষিক সূত্র ১/১/৭), ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৩।

[১০] গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র, অন্নংভট্টবিরচিতঃ তর্কসংগ্রহ, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪১০, পৃষ্ঠা- ৫৬।

[১১] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী(অনুদিত), প্রশস্তপাদভাষ্যম্, প্রথম ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০ , ।২৩০ -পৃষ্ঠা

বিশেষ নামক পদার্থটি এমন একটি ব্যাবর্তক ধর্ম যা কখনোই অনুগতাকার প্রতীতির জনক হয় না। বৈশেষিক মতে বিশেষ নামক পদার্থটি যেমন নিত্য দ্রব্যের ব্যাবর্তক হয়, তেমনই নিজেকে অন্য দ্রব্যে স্থিত বিশেষ হতেও ব্যাবৃত্ত করে তাই বিশেষকে স্বব্যাবর্তক বলা হয়েছে। এই হেতু প্রশস্তপাদাচার্য বিশেষকে 'অন্ত্যাঃ বিশেষ' বলেছেন।

সমবায়: বৈশেষিক সম্মত ষষ্ঠ পদার্থ হল সমবায়। মহর্ষি কণাদ সমবায়ের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন- "ইহেদমিতি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ"[12]। অর্থাৎ কার্য ও কারণের মধ্যে 'এই আধারে এই আধেয় আছে' এরূপ জ্ঞান যে সম্বন্ধ জন্য হয়, তা হল সমবায়। বৈশেষিক মতে সমবায় হল নিত্য সম্বন্ধ। দুটি অযুতসিদ্ধ পদার্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা হল সমবায়। যদি দুটি পদার্থ এমন হয় যারা একটি অন্যটিকে ছেড়ে বিদ্যমান হতে পারে না, তাদের অযুতসিদ্ধ পদার্থ বলে। যেমন, ঘট এবং তার রূপ, রূপ কখনও ঘটকে ছেড়ে থাকতে পারে না। আর এরূপ অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের মধ্যেকার সম্বন্ধ হল সমবায়। বৈশেষিক মতে অবয়ব-অবয়বী, দ্রব্যের সঙ্গে গুণের, দ্রব্যের সঙ্গে ক্রিয়ার, ব্যক্তির সঙ্গে জাতির, নিত্য দ্রব্যের সঙ্গে বিশেষের সম্বন্ধ হল সমবায়।এই সমবায় সম্বন্ধ সংযোগ সম্বন্ধের ঠিক বিপরীত। সংযোগ সমন্ধ হল দুটি যুতসিদ্ধ পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ। অভিপ্রায় এই যে, সংযোগ সম্বন্ধে আবদ্ধ সম্বন্ধীদ্বয়ের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও সম্বন্ধীদ্বয়ের অস্তিত্বের কোনরূপ হানি ঘটে না। যেমন হস্ত এবং পুস্তকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও সম্বন্ধীদ্বয় তথা হস্ত এবং পুস্তকের অস্তিত্বের কোনরূপ হানি ঘটে না। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধ হল অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। বৈশেষিক মতে এই সমবায় সম্বন্ধটি এক এবং এটি একটি নিত্য সম্বন্ধ।

অভাব: বৈশেষিক স্বীকৃত সপ্তম এবং সর্বশেষ পদার্থ হল অভাব। বৈশেষিক মতে ভাবভিন্ন পদার্থ হল অভাব। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে অভাবের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – "অভাবত্বং দ্রব্যাদিষট্-কান্যোন্যাভাববত্ত্বম্"[13] । অভিপ্রায় এই যে, দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের ভেদ যাতে রয়েছে তা হল অভাব নামক পদার্থ। এই অভাব নামক পদার্থটি 'নঞ' আদি নিষেধমূলক পদ জন্য জ্ঞানের বিষয় হয়। কোন কিছুর থাকা যেমন আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় তেমনই কোন কিছুর না থাকাও আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। যেমন, টেবিলে ঘট নেই এস্থলে টেবিলরূপ অধিকরণে ঘটের না থাকার জ্ঞান আমাদের হয়ে থাকে। এই জ্ঞানের বিষয় রূপে অভাব নামক পদার্থ বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। বৈশেষিক মতে অভাব দ্বিবিধ – সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। যে অভাব তার প্রতিযোগীর সংসর্গের বিরোধী হয় তাকে সংসর্গাভাব বলে। যেমন- বায়ুতে রূপের অভাব। আর যে অভাবের প্রতিযোগীতাটি তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সেই অভাবকে অন্যোন্যাভাব বলে। যেমন- ঘটে পটের অভাব। বৈশেষিক মতে এই সংসর্গাভাব আবার প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব ভেদে ত্রিবিধ। কোন পদার্থ উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণে বস্তুটির যে অভাব, তা হল প্রাগভাব। যেমন- ঘট উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণ মৃত্তিকাতে ঘটটির যে অভাব তা হল প্রাগভাব। কোন পদার্থের ধবংসের পর তার অধিকরণে বস্তুটির যে অভাব তা হল ধবংসাভাব। যেমন- মৃত্তিকা নির্মিত ঘটটি ধবংস হলে ঐ ধবংসাবশেষে ঘটটির যে অভাব তা হল ধবংসাভাব। আর অত্যন্তাভাব হল

---

[১২] ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন(অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ বৈশেষিক-দর্শনম্(বৈশেষিক সূত্র সহিতম্), কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা- ৩৯৫।

[১৩] শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য(সম্পাদিত), ভাষা-পরিচ্ছেদঃ, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, পুনর্মুদ্রণ, ১৪২৩,পৃষ্ঠা- ৭৮।

ত্রৈকালিক অভাব। যেমন- বায়ুতে রূপের যে অভাব, তা অতীতে ছিল না, বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। কাজেই বায়ুতে রূপাভাব হল অত্যন্তাভাব।

(২)

'আয়ুর্বেদ' শব্দটি 'আয়ু' এবং 'বেদ' এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। মানুষের জীবিতকালের নাম আয়ু। আর 'বেদ' শব্দটি এসেছে 'বিদ' ধাতু থেকে, যার অর্থ জ্ঞান। কাজেই আয়ু সম্বন্ধীয় জ্ঞান যে শাস্ত্রের সাহায্যে লাভ করা যায়, তাকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ চরকসংহিতায় বলা হয়েছে, চতুর্বিধ আয়ু তথা হিতায়ুঃ, অহিতায়ুঃ, সুখায়ুঃ ও দুঃখায়ুঃ এবং আয়ুর হিতকর ও অহিতকর সমস্ত বিষয়, আয়ুর পরিমাণ ও স্বরূপ নির্ণয় যে শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে তাকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলে[14]। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হল জীবের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং রোগ নিরাময় করা। এর নিমিত্ত আয়ুর্বেদসম্মত পদার্থসমূহ বিষয়ে যথাযথ অবগত হওয়া প্রয়োজন বলে শাস্ত্রকারগণ মনে করেন। যেহেতু পদার্থসমূহের জ্ঞানই আয়ুর স্বরূপ, আয়ুর পরিমাণ, তার হিত ও অহিতকর সমস্ত বিষয়ের নির্ধারক। অভিপ্রায় এই যে, পদার্থসমূহের যথাযথ জ্ঞান না থাকলে শরীরে ধাতুসমূহের বিকৃতি ঘটেছে কিনা, ধাতু বিকৃতি না ঘটলেও পরবর্তীকালে যাতে ধাতু বৈষম্য না ঘটে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কিংবা বিকৃত ধাতুকে সাম্যাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য উপযুক্ত পথ্যাদি এবং খাবার গ্রহণ করা – এসব ব্যর্থ হবে। কাজেই পদার্থ বিষয়ক আলোচনা আয়ুর্বেদশাস্ত্রেরও একটি মুখ্য আলোচ্য বিষয়। আয়ুর্বেদ তন্ত্রের ওপর যে সমস্ত গ্রন্থগুলি সহজলভ্য সেগুলির মধ্যে চরকসংহিতাই প্রাচীনতম এবং দার্শনিক আলোচনায় সম্পৃক্ত। তাই চরকসংহিতাসম্মত পদার্থতত্ত্বই এস্থলে আলোচ্য। ধাতুবৈষম্য দূর করার নিমিত্ত অর্থাৎ জীবের সমস্ত প্রকার শারীরিক ও মানসিক দুঃখসমূহ নিবৃত্তির নিমিত্ত এবং সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যময় জীবন প্রদানের জন্য আবশ্যকরূপে চরকসংহিতাতে সামান্যাদি ষড়বিধ পদার্থের উপদেশ করা হয়েছে। চরকসংহিতাতে বলা হয়েছে - আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে সামান্য, বিশেষ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও সমবায় – এই ষড়বিধ ভাব পদার্থ বিষয়ে যথাযথ অবগত হয়ে ব্যক্তি যদি আয়ুর্বেদতন্ত্রের সমস্ত বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করেন তাহলে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী সুখ এবং হিতকর আয়ু লাভ হবে[15]।এখন আয়ুর্বেদতন্ত্রে স্বীকৃত পদার্থসকল সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল-

সামান্য: আয়ুর্বেদ সম্মত ষড় ভাব পদার্থের মধ্যে প্রথম পদার্থ হল সামান্য। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয়েছে, মানব শরীর মূলতঃ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র এই সপ্ত ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত। মানব শরীরে যখন এই সপ্ত ধাতু, মল প্রভৃতি সমুচিত পরিমাণে না থাকে তথা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তখন ধাতুবৈষম্য দেখা দেয়। ফলস্বরূপ শরীরে আয়ুর পরিমাণের তারতম্য ঘটে। এমতাবস্থায় শরীরে সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য যে সকল দ্রব্য, গুণ, কর্মের নিমিত্ত শরীরে ধাতুসকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেই একই জাতীয় দ্রব্য, গুণ কিংবা কর্মের প্রয়োগ ও অনুশীলন করতে হয়। দ্রব্যাদি পদার্থের এই যে সমানভাব যা বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে তাকে

---

[১৪] "হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতম্। মানঞ্চতচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্ব্বেদঃ স উচ্যতে"।

নাগ, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র(সম্পাদিত), চরক-সংহিতা, সূত্রস্থানম্, কলকাতা, নবপত্রিকা প্রকাশন, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা- ৫।

[১৫] "সামান্যঞ্চ বিশেষঞ্চ গুণান্ দ্রব্যানি কর্ম্ম চ। সমবায়ঞ্চ তজ্ জ্ঞাতা তন্ত্রোক্তং বিধিমাস্থিতাঃ। লেভিরে শর্ম্ম জীবিতঞ্চাপ্যনশ্বরম্"।

ঐ, পৃষ্ঠা- ৪।

সামান্য বলা হয়।[16] চরক মতে সামান্য শব্দের দ্বারা তুল্যর্থতা বা এক পদার্থতা বোঝায়। তাই বলা হয়েছে, যার দ্বারা একত্ববোধ জন্মে তার নামই সামান্য। যা দ্রব্য, গুণ, কর্মে থাকে এবং একত্ব প্রতীতির জনক।

বিশেষ: বিশেষ পদার্থটি সামান্য পদার্থের ঠিক বিপরীত। যে পদার্থটি সকল সময় ক্ষয়ের কারণ হয় তাকে বিশেষ বলা হয়। অভিপ্রায় এই যে, মানব শরীরে রসাদি সপ্ত ধাতু, দোষ, মল প্রভৃতির বৃদ্ধি ঘটলেও শরীরের সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়, ফলস্বরূপ শরীর রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় রোগগ্রস্ত শরীরে রোগের উপশম ঘটিয়ে দেহে সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনতে চাইলে যে ধরণের দ্রব্য, গুণ, কর্মের নিমিত্ত সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে তার বিপরীত দ্রব্য, গুণ, কর্মের ব্যবহার করতে হবে। যার দ্বারা বর্ধিত ধাতু, দোষ, মল প্রভৃতি হ্রাসপ্রাপ্ত হবে এবং দেহে সাম্যাবস্থা ফিরে আসবে। দ্রব্যাদির উক্তরূপ অসমানভাবই হ্রাসের কারণ হয়ে থাকে। দ্রব্যাদিতে স্থিত এই অসমানভাব বা বৈপরীত্যই হল বিশেষ নামক পদার্থ। চরকসংহিতাতে বলা হয়েছে, যে পদার্থটির দ্বারা পৃথকত্বের বোধ জন্মায়, তা হল বিশেষ। বিশেষ শব্দটির দ্বারা পৃথক পদার্থতা বোঝায়[17]। এক ধাতু থেকে অন্য ধাতু যে পৃথক তা বিশেষ নামক পদার্থটি দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন- এক ঔষধ অন্য ঔষধ হতে পৃথক তা বিশেষ নামক পদার্থের জন্যই বোঝা সম্ভব।

দ্রব্য: দ্রব্য বিষয়ে আয়ুর্বেদ এর অভিমত এবং বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদের অভিমতের সাদৃশ্য বিদ্যমান। বৈশেষিক দর্শনের ন্যায় আয়ুর্বেদতন্ত্রেও যা কর্মের আশ্রয়, যা গুণের আশ্রয় এবং যা সমবায়িকারণ হয়, তাকেই দ্রব্য বলা হয়েছে। চরকসংহিতার সূত্রস্থানে বলা হয়েছে "যত্রাশ্রিতাঃ কর্ম্মগুণাঃ কারণং সমবায়ি যৎ"[18]। অর্থাৎ কর্ম ও গুণ যাতে আশ্রিত থাকে এবং যা সমবায়ি কারণ হয়, তাকেই দ্রব্য বলে। আয়ুর্বেদ মতে এই দ্রব্য নয় প্রকার, যথা- আকাশাদি প্রভৃতি পঞ্চভূত, তথা পৃথিবী, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি ভূতদ্রব্য, আত্মা মন, কাল এবং দিক[19]।

গুণ: চরকসংহিতাতে বলা হয়েছে গুণ হল এমন পদার্থ যা সমবায়ি কারণ হয় অথচ নিশ্চেষ্ট এবং কারণ হয়[20]। অভিপ্রায় এই যে, গুণ হল এমন পদার্থ যা কোন কার্য্য উৎপত্তিতে নিশ্চেষ্ট অর্থাৎ নিরপেক্ষ কারণ হতে পারে না অধিকন্তু কারণ হয়, যেটি কর্মের দ্বারা কার্য্য উৎপত্তিতে অংশগ্রহণ করে, তাকে গুণ বলে। বৈশেষিক দর্শনে চব্বিশপ্রকার গুণ স্বীকৃত হয়েছে, যদিও মহর্ষি কণাদ সতেরপ্রকার গুণের উদ্দেশ করেছিলেন। কিন্তু আয়ুর্বেদশাস্ত্রে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, গুরু, লঘু, শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, মন্দ, তীক্ষ্ণ, স্থির, স্বর, মৃদু, কঠিন, বিশদ (কর্দমাক্ত নয়), পিচ্ছিল, ঘন, মসৃণ, স্থূল, সূক্ষ্ম, সান্দ্র, দ্রব, বুদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি, অহংকার, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, প্রযত্ন, পরত্ব, যুক্তি, সংখ্যা, সংযোগ, বিভাগ, পৃথকত্ব, পরিমাণ, সংস্কার ও অভ্যাস- এগুলিকে গুণ বলা হয়েছে[21]।

---

[১৬] "সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণং। হ্রাসহেতুর্ব্বিশেষচ্চ প্রবৃত্তিরুভয়স্যতু।"। ঐ, পৃষ্ঠা- ৬।

[১৭] "সামান্যমেকত্বকরং বিশেষস্ত পৃথকত্বকৃৎ। তুল্যার্থতা হি সামান্যং বিশেষস্তবিপর্য্যয়ঃ"। ঐ, পৃষ্ঠা- ৬।

[১৮] ঐ, পৃষ্ঠা- ৬।

[১৯] "খাদীন্বাত্মা মনঃ কালো দিকশ্চদ্রব্যসংগ্রহঃ"। ঐ, পৃষ্ঠা- ৭।

[২০] "তদ্দ্রব্যংসমবায়ীতু নিশ্চেষ্টঃ কারণং গুণঃ"। ঐ, পৃষ্ঠা-৭।

[২১] "সার্থা গুর্ব্বাদয়ো বুদ্ধিঃ প্রযত্নান্তাঃ পরাদয়ঃ। গুণাঃ প্রোক্তাঃ প্রযত্নাদি কর্ম্মচেষ্টিতমুচ্যতে"। ঐ পৃষ্ঠা- ৭।

কর্ম: যা সংযোগ ও বিভাগের কারণ হয় এবং যা দ্রব্যে আশ্রিত তাকে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে কর্ম বলা হয়েছে[22]। প্রযত্নসাধ্য ক্রিয়ার নামই কর্ম, তাই কর্মকে চেষ্টিত বলা হয়েছে। কর্ম অন্য কোন কর্মকেও অপেক্ষা না করেই সংযোগ বিভাগের কারণ হয়ে থাকে। বৈশেষিক দর্শনে পাঁচপ্রকার কর্ম স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে 'কর্ম' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। সুস্থ জীবন ও রোগ উপশমের জন্য যা কিছু কর্তব্য তাকেই কর্ম বলা হয়েছে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে 'কর্ম' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে কর্তব্য, ক্রিয়া, চিকিৎসা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

সমবায়: আয়ুর্বেদ মতে সমবায় হল দুটি বস্তুর মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। দ্রব্যের সাথে গুণের যে অপৃথকভাবরূপ সম্বন্ধ তা হল সমবায়[23]। যেমন পৃথিবীর সাথে তার গুণ গন্ধের সম্বন্ধ হল সমবায়। কারণ গন্ধ কখনো ভূমি তথা ক্ষিতিকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তাদের মধ্যে অপৃথকভাব সম্বন্ধ। আয়ুর্বেদ মতে এই সমবায় হল একপ্রকার নিত্য সম্বন্ধ। যেমন- ঔষধের সঙ্গে তার কর্ম ও গুণের সম্বন্ধ হল অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ; কারণ ঔষধের ক্রিয়া ও গুণাগুণ ঔষধের মধ্যেই সর্বদা নিহিত থাকে, ঔষধ থেকে তার গুণাগুণকে পৃথক করা যায় না।

(৩)

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে এটা পরিষ্কার যে, আয়ুর্বেদতন্ত্রের পদার্থতত্ত্ব ও বৈশেষিক সম্মত পদার্থতত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। উভয়শাস্ত্রেই জীবের সকল প্রকার দুঃখ নিবৃত্তির সহায়ক রূপে পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে। উভয়শাস্ত্রই ভাবপদার্থের বিভাগ প্রসঙ্গে ষড়বিধ পদার্থের উল্লেখ করেছে। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিকসূত্রে 'অভাব' নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থের উদ্দেশ করেননি, তথাপি পরবর্তী ভাষ্যকারগণ মহর্ষির অনেক সূত্র হতে অভাব নামক স্বতন্ত্র পদার্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলে মনে করেন। কাজেই অনেক আচার্য মনে করেন অভাব নামক পদার্থটিও মহর্ষি কণাদ সম্মত। তদনুরূপ আয়ুর্বেদশাস্ত্রেও 'অভাব' নামক পদার্থের স্বতন্ত্র উদ্দেশ না থাকলেও আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন বিধি, নিয়ম ও আচারপ্রণালী হতে 'অভাব' নামক পদার্থ যে চরকসংহিতাতে স্বীকৃত তার বহু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন - চরকসংহিতাতে বলা হয়েছে, বর্ষা ঋতুতে অধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা পান না করলে শ্লেষ্মার আধিক্য ঘটবে না, ফলতঃ শ্লেষ্মাজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। অর্থাৎ রোগের কারণের অভাববশতঃ রোগজন্য দুঃখভোগের সম্ভাবনা থাকবে না। কারণের অভাবজন্য কার্যের অভাব আয়ুর্বেদশাস্ত্রে স্বীকৃত। তাই অনেক টীকাকার মনে করেন অভাব পদার্থও আয়ুর্বেদশাস্ত্র সম্মত। কাজেই অভাব পদার্থের স্বীকৃতির ক্ষেত্রেও উভয়শাস্ত্রের মধ্যে পদ্ধতিগত দিক থেকে বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে উভয় শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং আলোচ্য বিষয়েয ভেদহেতু উভয়ের পদার্থ বিষয়ক আলোচনায় বৈলক্ষণ্যও পরিদৃষ্ট হয়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে জীবের দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে। আর আয়ুর্বেদশাস্ত্রে জীবের কেবল সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক দুঃখ নিবৃত্তির নিমিত্ত পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে, তা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি নয়। পরবর্তীকালে জীব যদি আয়ুর্বেদতন্ত্রের বিধিসকল যথাযথভাবে পালন না করেন তাহলে পুনরায় ধাতুবৈষম্যজনিত দুঃখ ভোগ করতে পারেন। কিন্তু বৈশেষিক সম্মত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির পর জীবের পুনরায় দুঃখভোগের সম্ভাবনাই

---

[২২] "সংযোগে চ বিভাগে চ কারণং দ্রব্যমাশ্রিতম্। কর্ত্তব্যস্য ক্রিয়াকর্ম্ম কর্ম্মনান্যদপেক্ষতে"। ঐ, পৃষ্ঠা- ৭।

[২৩] "সমবায়োঽপৃথগ্ ভাবো ভূম্যাদীনাং গুণৈর্ম্মতঃ। স নিত্যো যত্রহি দ্রব্যং ন তত্রানিয়তো গুণঃ"। ঐ, পৃষ্ঠা- ৭।

থাকে না। এখন আমরা যদি একটু গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করি তাহলে বুঝতে পারব ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে যে ক্রমে পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে, আয়ুর্বেদশাস্ত্রে সে ক্রমে পদার্থের আলোচনা করা হয়নি। বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় – এভাবে ভাবপদার্থের ক্রম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু চরকসংহিতাতে সামান্য, বিশেষ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও সমবায় – এভাবে ষড়্ ভাবপদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা বুঝতে পারব, উভয়শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের ভেদহেতু এরূপ ভিন্নতা প্রদর্শিত হয়েছে। মহর্ষি প্রণীত বৈশেষিক দর্শন মূলতঃ মোক্ষানুসারী, তাই জীব মাত্রেরই আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ প্রাপ্তিই এই শাস্ত্রের পরম অভিপ্রেত। তাই বৈশেষিকাচার্যগণ বৈশেষিক দর্শন সম্মত নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির সহায়করূপে দ্রব্যাদি ষড়্ পদার্থের উল্লেখ করেছেন। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় – এই ষড়বিধ পদার্থের মধ্যে দ্রব্য হল আশ্রয়, আর গুণাদি পদার্থ দ্রব্যে আশ্রিত। সেইহেতু গুণাদি পদার্থের আলোচনার পূর্বে তাদের আশ্রয় দ্রব্য পদার্থের আলোচনা করা হয়েছে। এইজন্যই আচার্যগণ দ্রব্যাদি ক্রমেই পদার্থসমূহের উদ্দেশ ও লক্ষণ প্রদান করেছেন। কিন্তু আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হল জীবের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং রোগ নির্ধারণ পূর্বক রোগ নিরাময় করা, অর্থাৎ ধাতুসাম্য বজায় রাখা। কিন্তু যখন ধাতুসমূহ বৃদ্ধি বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তখন ধাতুসাম্য বিঘ্নিত হয় এবং জীব রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। সকল সময় বৃদ্ধির কারণ হল সামান্য এবং ক্ষয়ের কারণ হল বিশেষ। অভিপ্রায় এই যে, আয়ুর্বেদ মতে কোন কিছুর বৃদ্ধির কারণ হল সামান্য। আর হ্রাসের কারণ হল বিশেষ। যেমন, অধিক পরিমাণে মিষ্টি খেলে রক্তে শর্করা বৃদ্ধি পায়। এস্থলে অধিক মিষ্টি গ্রহণ জন্য শর্করা বৃদ্ধির কারণ হল সামান্য। অনুরূপভাবে তিক্ত স্বাদের খাদ্য গ্রহণ রক্তের শর্করার পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করে। এস্থলে তিক্ত স্বাদের বস্তু গ্রহণ জন্য যে শর্করার হ্রাস হচ্ছে তার কারণ হল বিশেষ। যাইহোক ধাতুসাম্য রক্ষা করার জন্য কিংবা বিঘ্নিত ধাতুকে সাম্যাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রথমেই বৃদ্ধি বা ক্ষয়ের জ্ঞান আবশ্যক, তথা সামান্য ও বিশেষ সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত হওয়া প্রয়োজন। এইহেতু চরকসংহিতাতে প্রথমে সামান্য, পরে বিশেষ এই ক্রমে পদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে অধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক অতীব নিবিড়। বিশেষ কিছু সম্প্রদায় ব্যতীত প্রায় সকল সম্প্রদায়ের পরম লক্ষ্য হল জীবের দুঃখ হতে আত্যন্তিক নিবৃত্তিলাভের পথ প্রদর্শন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রেও জীবের দুঃখ মোচনের নিমিত্ত নানাবিধ বিধিসকল প্রণয়ন করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল সুস্থ্ জীবন ও রোগমুক্তির ক্ষেত্রে আবশ্যক পদার্থসকল কি মোক্ষলাভের সহায়ক হতে পারে? বিপরীতভাবে বলা যায়, আয়ুর্বেদশাস্ত্র স্বীকৃত পদার্থসমূহে কি মোক্ষপ্রযোজকত্ব রয়েছে? এর উত্তরে বলা যায়, চরকসংহিতার শুরুতে দেখা যায় নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাবে যখন জীবকূল জর্জরিত তখন পুণ্যকর্মা মহর্ষিগণ জীবকূলকে রক্ষা করার নিমিত্ত ইন্দ্রদেবতার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কারণ মহর্ষিগণ উপলব্ধি করেছিলেন যদি জীবকূলের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে শাস্ত্রপ্রণয়ন, মোক্ষ, মোক্ষলাভের উপায় সমস্তই ব্যর্থ হয়ে পড়বে। জীবের মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য যে অধ্যয়ন, তপস্যা, উপবাস, ব্রত তথা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি কর্ম তখনই প্রাসঙ্গিক হবে যখন জীব রোগমুক্ত থাকবে। রোগ, ব্যাধিগ্রস্ত জীবের পক্ষে পদার্থতত্ত্বজ্ঞান, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদির অনুশীলন প্রায় দুষ্কর। সেইহেতু সর্বাগ্রে মানুষকে রোগমুক্ত থাকতে হবে। এর জন্য আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সম্মত পদার্থসমূহের যথাযথ জ্ঞান অর্জন পূর্বক শাস্ত্র প্রণীত বিধিসকলের অনুশীলন একান্ত কাম্য। এমতাবস্থায় আয়ুর্বেদশাস্ত্র স্বীকৃত পদার্থসকল সাক্ষাৎভাবে মোক্ষের সহায়ক না হলেও পরম্পরায় মোক্ষের সহায়ক হয়ে থাকে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1) গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র, অন্নংভট্টবিরচিতঃ তর্কসংগ্রহ, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১০।
2) দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী(অনুদিত), প্রশস্তপাদভাষ্যম্, প্রথম ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০১০।
3) নাগ, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র(সম্পাদিত), চরক-সংহিতা, সূত্রস্থানম্, কলকাতা, নবপত্রিকা প্রকাশন, ১৯৮৪।
4) ব্রজবিদেহী, মহন্ত শ্রী স্বামী সন্তদাসজী, ওঁ দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, শ্রী অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য, ১৩৯২।
5) ভট্টাচার্য্য, করুণা, ন্যায় বৈশেষিক দর্শন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩।
6) ভট্টাচার্য, জয়(সম্পাদিত), শিবাদিত্য বিরচিত সপ্তপদার্থী, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার, ২০১০।
7) ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন(অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ বৈশেষিকদর্শনম্-, কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩।
8) ভট্টাচার্য, শ্রী মোহন এবং শ্রী দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারতীয় দর্শন কোষ, কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৫৮।
9) মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৬।
10) শাস্ত্রী, শ্রী গৌরীনাথ, কিরণাবলী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯০।
11) শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য(সম্পাদিত), ভাষাপরিচ্ছেদঃ-, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪২৩।
12) সেনগুপ্ত, কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্রনাথ(সম্পাদিত), চরকসংহিতা, বারাণসী, চৌখাম্বা ওরিয়েন্টাল, ১৯৯১।
13) Mishra, Sri Narayan (Ed.), SriSankar Mishra's Vaisesiksutropaskara, Varanasi, The Chowkhamba Sanskrit Serises Office, 1969.
14) Sastri, Dharmendranath, Varatiya Darsan Sastra, Benaras, Matilal Benarsidas Publishers, 1653.
15) Sastri, Pt. Hargovinda, Amarkosa, Varanasi, Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1998.Sengupta, Kaviraj Shree Narendranath and Kaviraj shree Balaichandra Sengupta (Ed.), Caraka-Samhita with Ayurvedadipika and jalpakalpataru, Varanasi, Chaukhambha Orientalia, 1991.
16) Tarkatirtha, Amarendra Mohan and Narendra Chandra Vedantatirtha, Sivaditya's Saptapadarthi (with three commentaries), Calcutta, Metropolitan Printing & Publishing House, 1934.